MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২২; জানুয়ারি ২০২৩
দাম : দশ টাকা

সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ

সুষ্ঠু নির্বাচন নয়, গায়ের জোরে ক্ষমতায় থাকতে ইভিএম কারচুপির পাঁয়তারা করছে সরকার

মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৫তম বার্ষিকী ও বাসদের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২৫ নভেম্বর বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আহ্বায়ক কমরেড নিখিল দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, জেলা শাখার সদস্যসচিব আবু নাঈম খান বিপ্লব, সদস্য অসিত বরণ বিশ্বাস, সেলিম মাহমুদ, বেলায়েত হোসেন, এম.এ মিল্টন ও এস এম কাদির।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৫তম বার্ষিকী এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের শ্রমজীবী মানুষসহ সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, কেন আমরা রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববার্ষিকী স্মরণ করছি? কারণ, আমরাও এদেশের বুকে শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্র তথা শোষণমুক্ত সমাজ, প্রতিষ্ঠা করতে চাই! ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বলশেভিক পার্টির নেতা কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে গঠন করেছিল ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র মানব সভ্যতাকে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। মানুষকে দিয়েছিল সমস্ত রকমের শোষণ-বঞ্চনা ও বন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ। মানব কল্যাণের এমন কোন অভিমুখ ছিল না যেদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিত্য নতুন অর্জনের স্বাক্ষর রাখেনি। শ্রমিকশ্রেণি রাশিয়াতেই প্রথম রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নাই–এর আগে শ্রমিকশ্রেণি ফ্রান্সে ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখন তারা ৭২ দিন রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিল। প্যারি কমিউন থেকে শিক্ষা নিয়ে ৪৬ বছর পরে কমরেড লেনিন রাশিয়ায় বিপ্লব সম্পন্ন করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছিল–শ্রমজীবী মানুষ শুধু মাত্র শোষণ-দুঃশাসন আর উপেক্ষার শিকার হবে না, শুধু গতর খাটা শ্রমিক হবে না, শুধু কারখানায় উৎপাদনের চাকা ঘুরাবে না–তারা রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতাও রাখে।

আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আমরা প্রতিষ্ঠার ৪২তম বার্ষিকী পালন করছি এবং এই দুটি দিবসকে স্মরণ করে আজকের এই জনসভা।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি মানুষ ও মধ্যবিত্ত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করে আমাদের পার্টির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ১৯৭১ সালে এদেশের শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুবক, নারীসহ সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নয় মাসের সশস্ত্র লড়াই, ৩০ লাখ মানুষের শহিদি আত্মদান, ২ লাখ মা-বোনের ওপর অমানবিক নির্যাতন, কোটি কোটি মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও ব্যাপক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শুরু হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দেশের শাসনতন্ত্র–সংবিধান প্রণীত হয়েছে। যার ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হবে। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তান রাষ্ট্র অধিকাংশ সময় পরিচালিত হয়েছিল সামরিক শাসনের মাধ্যমে, তাই প্রত্যাশা ছিল স্বাধীন দেশ হবে জনগণের ক্ষমতায়নের একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শোষণ-বৈষম্যহীন

সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র। পাকিস্তান ছিল একটা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, তার বিপরীতে বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ সেক্যুলার রাষ্ট্র ও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তান রাষ্ট্র সিয়াটো-সেন্টো চুক্তিতে যুক্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বেধে পরিচালিত হয়েছিল কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ কোন সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাধবে না, নতজানু হবে না। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, লুণ্ঠন যেখানে আছে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র সোচ্চার থাকবে। মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করবে। অন্যায় অবিচার শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষ যাতে ন্যায় বিচারের অধিকার পায় সেই লক্ষ্যে সামাজিক ন্যায় বিচারের সমাজ প্রতিষ্ঠি হবে। বাংলাদেশের জনগণ জনযুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিল, সংবিধানে সেই আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে ধারায় দেশকে পরিচালিত না করে–উঠতি ধনিকশ্রেণির রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শোষণমূলক ধনবাদী পথে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করে জনগণকে অধিকার বঞ্চিত করে।

তারা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি গ্রহণ করল–ধনিকশ্রেণিকে তোষণ আর গরিব, শ্রমিক-কৃষক, মেহনতী মানুষকে শোষণ করার। যে কারণে দেখা গেল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা ছিল মাত্র দুইজন কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থা যেহেতু শোষণ ও নিপীড়নের পক্ষে, সে কারণে '৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে কোটিপতির সংখ্যা পাঁচজনে উন্নীত হলো। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। আর দুর্ভিক্ষের পর বাংলাদেশের কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৭ জনে।

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর দেশে ভূমিহীন খেতমজুর-দিনমজুরের সংখ্যা না কমে বরং বেড়ে চলল। '৭১ সালে ভূমিহীনের সংখ্যা শতকরা ৪০ জন ছিল আর স্বাধীনতার ৫১ বছর পর এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৭২ জনে। একদিকে বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অপরদিকে দিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কোটিপতির সংখ্যা। সে কারণে স্বাধীনতার নয় বছরের মাথায় ১৯৮০ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করা হয়েছিল। গত ৪২ বছর ধরে আমরা দেশের গ্রাম-গঞ্জে, উপজেলা-জেলায়, শিল্পাঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের কাছে গিয়েছি এবং তাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সাধ্যমত আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলেছি। দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত ছিলাম। জাতীয় সম্পদ রক্ষার সংগ্রামে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। আমরা সকল প্রকার শোষণ-লুণ্ঠন ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছি।

তিনি বলেন, নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিতে জনজীবন অতিষ্ঠ। চাল-ডাল, আটা, তেল-নুন, চিনিসহ নিত্যপণ্যের দাম লাগামহীনভাবে বাড়ছে এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে দাম বাড়ছে জ্বালানি তেল, গ্যাস-বিদ্যুত, পানিরও। শিক্ষা-চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে। বাড়িভাড়া-গাড়িভাড়া বাড়ছে। শ্রমজীবী মানুষ জীবন নির্বাহ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হিমশিম খাচ্ছে। ঘরে ঘরে অভাব-অনটন দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বিরাজ করছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (এফএও) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে পরিবারের খাদ্য কেনার জন্য ৬৪ শতাংশ মানুষ ঋণ নিয়েছে। ২৯ শতাংশ পরিবার তাদের সঞ্চয় ভেঙেছে। খাবার কিনতে গিয়ে ১০ শতাংশ পরিবার তাদের গত ১২ মাসের সঞ্চয় ভেঙে ফেলেছে। মানুষ তাদের খাদ্য তালিকা থেকে মাছ-মাংস, দুধ-ডিম বাদ দিয়েছে। ৩৮ শতাংশ মানুষ খাবার কিনতে না পেরে অপুষ্টিতে ভুগছে। (প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর)। এই চিত্রটা আরও পরিষ্কার হয় যখন দেখা যায় ওএমএস এর পণ্য কেনার জন্য শত শত মানুষ সারাদিন ট্রাকের লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেও খালি হাতে ফিরে যাচ্ছে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের দৌরাত্মে বাজার অস্থিতিশীল। সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের কাছে মানুষ জিম্মি ও অসহায় হয়ে পড়েছে। সরকার সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। উপরন্তু তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে, পৃষ্ঠপোষকতা করছে। বাণিজ্যমন্ত্রী আক্ষেপ করে বলেছেন, ব্যবসায়ীরা কথা রাখেননি। ব্যবসায়ীরা কোরবানির ঈদের আগে বাজারে সয়াবিন তেলের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সরকারের সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করেই দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল। খাদ্যমন্ত্রী ১ সেপ্টেম্বর ওএমএস উদ্বোধনকালে বলেছেন, বাজারে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব হয় না। একদিকে করোনায় মানুষ চাকরি হারিয়েছে, কাজ হারিয়ে বেকার হয়েছে। মানুষের আয় কমেছে তাই খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগামী ২০২৩ সাল দেশে দুর্ভিক্ষ হতে পারে। পরে আবার তা সংশোধন করে বলেছেন, অভাব হবে না কারণ আমাদের তিনবার ফসল হয় আমাদের যে মজুদ আছে তাতে সমস্যা হবে না।

অমর্ত্য সেন ১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষসহ অন্যান্য দুর্ভিক্ষকে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, 'খাদ্যের অভাবে পৃথিবীতে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি, হয়েছে সুষম বণ্টনের অভাবে।' দুর্ভিক্ষের সময়েও দেশে খাদ্য মজুদ পর্যাপ্ত ছিল এবং বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করা হয়েছিল। কিন্তু মজুদ থাকলে কী হবে যদি বিলিবণ্টন সুষ্ঠুভাবে না হয় তাহলে অভাব দূর হবে না। মানুষের কাছে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার যে সরকারি নীতি ও প্রথা সেগুলোর কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তিনি বাংলাদেশের ৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা

বলেছেন। কাজেই দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন হলেও পুঁজিবাদী-মুক্তবাজারী অর্থনীতির ফলে বিলিবণ্টন সুষ্ঠুভাবে হবে না। বাজার সিন্ডিকেটের কাছেই মানুষ জিম্মি হয়ে থাকবে।

তিনি বলেন, দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ মানুষ খাবার পাচ্ছে না কেন? বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কয়েক বছর ধরে প্রচার করা হচ্ছে যে, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ কথা ঠিক যে, দেশের কৃষকরা খাদ্য উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বাড়িয়ে চলছে। স্বাধীনতার ৫১ বছরে কৃষকরা গড়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়ে চলছে। বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন প্রায় চার কোটি টন আর জনসংখ্যা সাড়ে ১৬ কোটি। আবার বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা) এফএও গত সেপ্টেম্বরের খাদ্যশস্য আমদানি প্রতিবেদনে দেখিয়েছে বাংলাদেশ গত অর্থবছরে ১ কোটি ৫ লাখ ৩৩ হাজার টন খাদ্য আমদানি করছে। চলতি বছর আমদানির পরিমাণ ১ কোটি ৪ লাখ ৪৯ হাজার টন হতে পারে। দেশের কৃষি বিভাগ এক তথ্য দেয়, কৃষি মন্ত্রণালয় আরেক তথ্য দেয় কোনোটার সাথে কোনোটার মিল নাই। বাস্তবে জনগণকে গোলক ধাঁধাঁয় ফেলে প্রকৃত সত্য আড়াল করতে একেক বার একেক তথ্য দেয়া হয়। প্রকাশিত পরিসংখ্যানগুলো বলছে দেশে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, মাংসের উৎপাদন বেড়েছে, মাছের উৎপাদন বেড়েছে, ফল-শাকসবজির উৎপাদন বেড়েছে এক কথায় সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে। তাহলে প্রশ্ন ৩৮% মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে কেন?

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলছে দুর্ভিক্ষ হতে পারে, কৃষি মন্ত্রী বলছে বিরোধী দল দুর্ভিক্ষের কথা বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। জনগণকে নাকি ভয় দেখাচ্ছে এবং সরকারকে বিপদে ফেলানোর চেষ্টা করছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করব নাকি কৃষি মন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করব? দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও মানুষের অভাব তো দূর হয়নি। তাহলে কেন আজকে মানুষের ঘরে অভাব থাকবে? কেন অর্ধাহারে অনাহারে মানুষ দিন কাটাবে। আমরা তাই বলতে চাই শুধু উৎপাদানের প্রাচুর্য দিয়ে জনগণের অভাব দূর হবে না, অভাব দূর করার জন্য বিলিবণ্টন ব্যবস্থায় পরিবর্তন জরুরি। বিলিবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে সমতা না থাকে, তাহলে অভাব-দারিদ্র্য দূর হবে না, দুর্দশা ঘুচবে না। এ কারণে আমরা বলছি উৎপাদন ও বিলিবণ্টনের মধ্যে একটা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেটা সম্ভব নয়। এর জন্য ব্যবস্থার বদল করতে হবে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, আমরা দাবি তুলছি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা চাই। বিশ্বের ৯০টি দেশে ন্যূনতম মজুরি আইন করে নির্ধারণ করা হয়। এর মানদণ্ড কী হবে? আমরা বলেছি শ্রম আইনে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১০টি বিষয় বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। সে বিষয়গুলোকে ভিত্তি হিসেবে নিতে হবে। আমাদের দেশে ৪ ধরণের মজুরি কাঠামো ও কমিটি আছে। ১. জাতীয় পে-কমিশন; ২. মজুরি কমিশন; ৩. ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ও ৪. ওয়েজ বোর্ড। আইএলও ১৩১ নং কনভেনশনে বলা হয়েছে, 'সর্বনিম্ন মজুরি অবশ্যই আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, জীবনযাত্রার ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট হিসাব করে দেখিয়েছেন দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করলে একজন পুরুষ গার্মেন্টস শ্রমিকের দৈনিক ৩ হাজার ৩৬৪ কিলোক্যালোরি এবং নারী শ্রমিকের ২ হাজার ৪০৬ কিলোক্যালোরি এনার্জি লাগে। বিভিন্ন সেক্টরের কাজের ধরন অনুযায়ী এ হিসেবের কিছুটা কমবেশি হবে।

বেসরকারি খাতের শ্রমিকদের মজুরি অবশ্যই সরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রাপ্ত আর্থিক মজুরির বেশি হতে হবে। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারে বলা হয়েছে, ব্যাংক অফিস সহকারী, নিরাপত্তা প্রহরী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং মেসেঞ্জাররা ন্যূনতম মজুরি হিসেবে ২৪ হাজার টাকা পাবেন। আমরাও তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছি গার্মেন্টসে ২৪ হাজার টাকার নিচে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি হতে পারে না, এর নিচে মজুরি হলে সেটা ন্যায্য হবে না, কোনভাবেই মনুষ্যচিত হবে না। অন্যান্য সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা আইন করে বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রবাসী শ্রমিক ও রেমিটেন্স নিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ১ কোটি ২৩ লাখ অভিবাসী নারী-পুরুষ শ্রমজীবী মানুষ পৃথিবীর প্রায় ১৬৯টি দেশে শ্রমশক্তি বিক্রি করছেন। প্রবাসে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, খাদ্যাভ্যাস ও বৈরী পরিবেশ আর কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রতিদিন প্রায় ১২ জন প্রবাসী শ্রমিক লাশ হয়ে দেশে ফেরত আসে। প্রবাসে শ্রমিকরা চিকিৎসারও সুযোগ পাচ্ছে না। বিদেশে যেতে গিয়ে তারা সাগরে ডুবে মরে, বিভিন্ন দেশের জঙ্গলে গণকবরে বাংলাদেশি শ্রমিকদের লাশ পাওয়া যায়। দূতাবাসসমূহে তাদের যথাযথ সেবা দেয় না। বিমান বন্দরে তাদের নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। এত কষ্ট স্বীকারের মধ্যদিয়ে তারা আমাদের রিজার্ভ গড়ে তোলে।

রিজার্ভ সংকট, বিদেশে অর্থ পাচার ও সরকারের মিথ্যাচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছু দিন আগেও সরকার দেশবাসীর সামনে বলেছে দেশে কোন আর্থিক সংকট নাই। গত বছর আগস্ট মাসে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রিজার্ভ ছিল ৪৮ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ২২ বিলিয়ন ডলার এসেছে আমাদের প্রবাসী শ্রমিকের আয় থেকে, আর গার্মেন্টস শ্রমিকেরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যে উৎপাদন করে এবং অন্যান্য খাতের রপ্তানি মিলিয়ে ৩৪ বিলিয়ন ডলার এসেছে। আমরা তখন বলেছিলাম সরকার রিজার্ভের মজুদের কথা বলছে তা সঠিক নয়। সরকার তখন আমাদের

কথা স্বীকার করেনি, অথচ যখন আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকসহ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলো এসে বললো সরকারের কাছে রিজার্ভের সঠিক তথ্য নেই এবং রিজার্ভের যে মজুদের কথা বলছে তা সঠিক নয়। তখন তারা সেটা মেনে নেয়। সরকার এটা নিয়ে জনগণের সামনে লুকোচুরি খেলছে। বিভিন্ন ব্যাংক ডলারের অভাবে এলসি খুলছে না। তারা গ্রাহকদের বলছে আপনারা যদি ডলার জোগাড় করে আনতে পারেন তাহলে এলসি খুলতে পারবেন।

এই রকম পরিস্থিতিতে সরকার সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা আইএমএফ-এর কাছ থেকে ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ নেয়ার জন্য তাদের হাতে-পায়ে ধরছে। আইএমএফ বলছে তোমাদের মজুত রিজার্ভের সঠিক তথ্য আমাদের জানাও। সরকার তা জানাতে পারেনি। তখন আইএমএফ বলছে তোমাদের এখন রিজার্ভ আছে ২৬ বিলিয়ন ডলার যা দিয়ে মাত্র তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে।

এখন তারা আইএমএফ-এর গণবিরোধী শর্তে ঋণ নিচ্ছে। আইএমএফ বলছে, সরকার বেশি ভর্তুকি দেয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও কৃষি খাতে। সরকার আইএমএফ-এর শর্ত বাস্তবায়ন করতে ২১ নভেম্বর পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম ১৯ দশমিক ৯২ শতাংশ বাড়িয়েছে। এর আগে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। করোনার সময় যাতে রেমিটেন্স বেশি আসে তার জন্য ২ শতাংশ প্রণোদনা ঘোষণা করেছিল। আইএমএফ ঐ ২% প্রণোদনা তুলে দিতে বলেছে। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি বলছে, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৬৪ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যায়। তারা টাকা পাচার করে কানাডায় বেগম পাড়া, মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম গড়ে তুলছে। পাচার করা টাকা যদি ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে আমাদের আইএমএফ-এর কাছ থেকে শর্তযুক্ত ঋণ নিতে হয় না। যারা টাকা-সম্পদ পাচার করেছে, ব্যাংকের টাকা মেরে দিয়ে ঋণ খেলাপি হয়, তারাই আবার নিজেদের দেশপ্রেমিক দাবি করছে।

দেশের অর্থমন্ত্রী সংসদে বলেন, কারা দেশের টাকা নিয়ে যায়, সেই তালিকা আমার কাছে নেই। পাচারকারীদের নামগুলো আমাদেরকে দেন। গত বছরের ১৮ নভেম্বর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এক অনুষ্ঠানে বলেন, বাংলাদেশ থেকে কানাডায় টাকা পাচারের ২৬ জনের কথা তিনি জেনেছেন, এর মধ্যে সরকারি কর্মকর্তরাই বেশি আরও আছে রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীরা।

দেশের কৃষক ও কৃষি সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের কৃষকরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উৎপাদন করে দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাবার যোগান দেয় অথচ তারা ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না, সরকারি সহযোগিতা পায় না। সার-বীজ, কীটনাশক-সেচ, বিদ্যুৎসহ কৃষি উপকরণের দাম দফায় দফায় বেড়ে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তাদের সন্তানেরা লেখাপড়া করতে পারে না, পরিবারে সদস্যদের রোগবালাই হলে চিকিৎসা করাতে পারে না। সারা বছর তাদের কাজ থাকে না। ২০-২৫ হাজার টাকা কৃষি ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণে ১ লাখ ৬৮ হাজার কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা ও হুলিয়া জারি করা হয়েছে। সম্প্রতি ঈশ্বরদীতে ১২ জন কৃষককে ঋণের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অন্যরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন না করে রাষ্ট্রীয় ২৬টি পাটকল ও ৬টি চিনিকল বন্ধ করে দিয়েছে। কৃষি-গার্মেন্টসসহ দেশের শ্রমিক ও প্রবাসী শ্রমিক–এই তিন খাত আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে। অথচ এরা সবাই অবহেলার শিকার।

কমরেড ফিরোজ বলেন, শাসকরা দেশের স্বার্থের কথা ভাবে না। শাসকশ্রেণি দেশের অর্থপাচার রোধে যেমন উদাসীন অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য দেশের সম্পদ লুটপাটের সকল ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তারা আমাদের পাচারের টাকা ফেরত আনছে না। গত ৫১ বছর যে সরকারগুলো রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে তারা সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু থেকেছে। তারা আমাদের পাশের দেশ ভারত থেকে আমাদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারেনি। শাসকরা আমাদের শুনিয়ে আসছে ভারত আমাদের বন্ধু। অথচ তারা বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানির সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতে পারেনি, সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে পারেনি এবং এন্টি ডাম্পিং ট্যাক্স বন্ধ করতে পারেনি।

খেলাপি ঋণ ও ব্যাংক ডাকাতদের সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকার যে ধনীদের তোষণ করে সেটা বুঝা যায় ইসলামি ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংকসহ ৭টি ব্যাংক এক ব্যক্তি সরকারের প্রশ্রয়ে দখল করে নিয়েছেন। সে ব্যাংকগুলো থেকে ১ থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা তুলে নিয়ে ব্যাংকগুলোকে ফোকলা করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করে খেলাপি হচ্ছে, রি-সিডিউল করে নিচ্ছে। আদালতে মামলা করে তারা খেলাপি হচ্ছে। খেলাপির পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছেই। আওয়ামী লীগের বর্তমান ৩ মেয়াদের শাসনামলে ২০০৯ সাল থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত খেলাপি ঋণ ২২ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকা। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরাও প্রশ্ন করছে তারা কি শুধু দর্শক হয়ে লুট করা দেখবেন? বর্তমান অর্থমন্ত্রী ব্যাংকের অবস্থা কোথায় খারাপ জানতে চেয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সাবেক প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম বলেছেন, খেলাপি ঋণ ১ লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকা নয়, বাস্তবে এর পরিমাণ হবে ৪ লাখ কোটি টাকা। অর্থাৎ যেগুলো ইতিপূর্বে অবলোপন করা হয়েছে, যে সব খেলাপি ঋণের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রয়েছে, এ হিসেবে সেগুলো ধরা হয়নি। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়ার রেওয়াজ আওয়ামী লীগ দাঁড় করিয়েছে। ৫১ বছর পরে কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সোয়া লাখে। এভাবে ধনী কোটিপতির সংখ্যা দুর্যোগে, দুর্ভিক্ষে, দুই বছরব্যাপী করনাকালেও বেড়েছে।

আয় বৈষম্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি। এক দিকে মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে নামছে আর অন্যদিকে কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে চলছে। করোনায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে নেমে গেছে, আগে ছিল আড়াই কোটি। সব মিলিয়ে ছয় কোটি মানুষ এখন দরিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করছে। অপর দিকে করোনার সময় ১৭ হাজার ২২৯ জন নতুন কোটিপতি হয়েছে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, শাসকশ্রেণি জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের যে অধিকার 'ভোট' সেটাও শাসক শ্রেণি কেড়ে নিয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশে যতগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এর কোনটাই অবাধ-সুষ্ঠু হয়নি। সেখানে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি। দেশে এ পর্যন্ত ১১টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, এর মধ্যে সাতটি হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে আর চারটি হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে। সেই সাতটি নির্বাচনের সবগুলোই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, জাল-জালিয়াতিতে ছিল ভরা। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো আপেক্ষিক অর্থে সুষ্ঠু হয়েছে। অর্থাৎ জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। ওই চারটিও পরিপূর্ণ মাত্রায় অবাধ সুষ্ঠু হয়নি–ওই নির্বাচনগুলোতেও ছিল কালোটাকার ছড়াছড়ি, পেশিশক্তি প্রদর্শন, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার অপ-প্রয়োগ। তাই এখানে নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। সংখানুপাতিক নির্বাচন দিতে হবে।

জাতীয় সংসদে 'এলাকাভিত্তিক একক প্রতিনিধিত্বে'র বদলে 'জাতীয়ভিত্তিক সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এই ব্যবস্থায়-জাতীয় সংসদকে প্রধানত জাতীয় নীতি-নির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন করার এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাজকর্ম তদারক করার সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। স্থানীয় সব উন্নয়নমূলক ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাজর্কম সেই এলাকার নির্বাচিত স্বশাসিত স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত করতে হবে। এর ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থার ও প্রসাশনের বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারের প্রকৃত ক্ষমতায়ন এবং রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থায় তৃণমূলে জনগণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে।

স্বাধীন বাংলাদেশে দলীয় সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন হয়েছিল ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে। সেই নির্বাচনে ১৮ থেকে ২০টি আসনে বিরোধী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয়ে ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাস, কারসাজি ও ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী প্রভাব খাটিয়ে তাদের বিজয়ী হতে দেয়নি। জাসদের অন্যতম সহসভাপতি বরিশালের ডা. আজহার উদ্দিনকে মনোনয়পত্র জমা দিতে দেয়নি। গোপালগঞ্জের আওয়ামী লীগের এক প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ করানোর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ন্যাপের কমলেশ বেদজ্ঞ ও তার প্রধান প্রচার কর্মী সিপিবি'র জেলা সম্পাদক অলিউর রহমান লেবুসহ ৪ জনকে খুন করা হয়। কুমিল্লার দাউদকান্দিতে জাসদের প্রার্থী আব্দুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ারের নিশ্চিত বিজয় ঠেকাতে ভোটের বাক্স হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় এনে খন্দকার মোশতাক আহমেদকে জিতিয়ে দেয়া হয়। জাসদ সভাপতি মেজর এম এ জলিলকে হারিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হরনাথ বাইনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। টাঙ্গাইলের ড. আলীম আল রাজিকে জালিয়াতি করে হারানো হয়।

১৯৭৩ সাল থেকেই শুরু হয়েছে নির্বাচনে জালিয়াতি। এর পর ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ জন নির্বাচিত হওয়া এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে দিনের ভোট রাতে করে নির্বাচন ব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে নির্বাসনে পাঠায়। এখন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে ভোট সুষ্ঠু হবে এবং মানুষ ভোট দিতে পারবে এটা আর কেউ বিশ্বাস করে না। আমরা তাই বলেছি শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে, সংসদ ভেঙে দিতে হবে। নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। বাংলাদেশের মানুষকে এই দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, রাজনীতিকে শাসকরা খেলা ও বিনোদনের স্তরে নামিয়ে এনেছে। রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ। রাজনীতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তার অর্থনীতি কী হবে, সংস্কৃতি কী হবে। কীভাবে তার শাসন-প্রশাসন পরিচালিত হবে? তার শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি-পররাষ্ট্রনীতি কী হবে, কৃষিনীতি-বাণিজ্যনীতি কীভাবে প্রকাশিত হবে ইত্যাদি। মানুষ এগুলো থেকে দলগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, দৃষ্টিভঙ্গি বুঝবে। প্রত্যেক দল তার নীতি-আদর্শ ঘোষণা করবে, জানাবে–জনগণের জন্য কীকাজ, কী উন্নয়ন-অঙ্গীকার করবে। সেগুলো সমাজে মানুষ চর্চা করবে, আলাপ-আলোচনা, যুক্তি-তর্ক করবে। তারপর যা ভালো মনে হয় তা গ্রহণ করবে। এখন এটা পরিষ্কার এই ধনিকশ্রেণির দলগুলোর নীতি-আদর্শের কোন বালাই নাই। একটাই তাদের লক্ষ্য–ক্ষমতায় যেতে হবে জনগণের সম্পদ, রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করতে হবে। সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক এখন প্রতিদিন বলে চলছে–খেলা হবে। রাজনীতি নিয়ে তো খেলা হতে পারে না? এর মধ্য দিয়ে তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব প্রকাশ পেল। তারা রাজনীতিকে আজকে খেলার পর্যায়ে নিয়ে গেছে কেন? আমরা বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের পক্ষ থেকে এবং বামপন্থিদের পক্ষ থেকে বলতে চাই খেলা নয়, লড়াই হবে। পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ উচ্ছেদের লড়াই। শ্রমজীবী জনগণ শোষকদের উৎখাতের মরণপণ লড়াইয়ে রাস্তায় নামবে। শ্রমজীবী মানুষ বুর্জোয়াদের উৎখাত করবে। এই প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বাংলাদেশ শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

রুশ বিপ্লব সম্পর্কে কমরেড ফিরোজ বলেন, এ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা কমিয়েছিল এবং শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার সুরক্ষিত ছিল, প্রকৃত অর্থেই তারা শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করেছিল। আর আমাদের দেশে শ্রমিককে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। আইন থাকলেও আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন করা দুরূহ।

রুশ বিপ্লব শিক্ষা-চিকিৎসা, দর্শন-ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য, চলচ্চিত্র-নাটক খেলাধুলা, বিজ্ঞানসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। সমাজতন্ত্রের শক্তি কত বিশাল সেটা বুঝা যায় ইউরোপের পিছিয়ে পড়া একটা রাষ্ট্র বিপুল সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নই দুনিয়ায় প্রথম নারীর পূর্ণাঙ্গ ভোটাধিকার নিশ্চিত করেছিল। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল। বড় বড় কারখানায়, খামারের ম্যানেজার হিসেবে নারীরা নিয়োগ পেয়েছিল, মহাকাশে প্রথম নারী ভেলেন্তিনা তেরেস্কোভাকে পাঠিয়েছিল। ১৯২৯ সালের মহামন্দার সময়েও সেভিয়েত অর্থনীতির সমৃদ্ধি বেড়েই চলছিল। বেকারত্বের অভিশাপ, ভিক্ষাবৃত্তির অপমানজনক লজ্জা থেকে দেশকে মুক্ত করে ১৯৩৭ সালেই কমরেড স্তালিন ঘোষণা করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ায় কোন বেকার নেই, ভিক্ষুক নেই, পতিতা নেই। এ কথা ঠিক যে, এখন সেখানে সমাজতন্ত্র নেই–এটা একটা সাময়িক বিপর্যয়। নতুন অজানা পথ চলতে গেলে ভুল হয়। এই বিপর্যয়ের কিছু অভ্যন্তরীণ কারণ যেমন আছে আবার বাহ্যিক কারণও আছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কারণে রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য নিঃশেষ হয়নি। তাইতো গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ বিস্ময়ে ভাবছে সমাজতন্ত্র মানবজাতিকে কি দিয়েছিল আর সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় মানবজাতি কী সম্পদ হারিয়েছে। একথা আজ বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে, সমাজতন্ত্র–পুঁজিবাদ পরবর্তী মানবসভ্যতার একটা উন্নত স্তর। এটা সমাজ বিকাশের অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি। সমাজতন্ত্র শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদ ও শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজের অন্তবর্তীকালীন ধাপ। সমাজতন্ত্র শ্রেণিবিভক্তি সমাজ থেকে যাত্রা শুরু করে শ্রেণি বিলোপের পর্যায় যায়। উৎপাদন, বিলিবণ্টন, শাসন-প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানা ও যৌথ নেতৃত্বের চর্চায় তা কার্যকরী হয়। ধারাবাহিক বিকাশের মধ্যদিয়ে সমাজতন্ত্র শ্রেণিবিভক্ত সমাজ থেকে শ্রেণিহীন সাম্যবাদে পৌঁছায়। তার কর্মপন্থায় ভুল হলে তা পশ্চাদমুখী হয়ে পড়ে।

আমরা বাসদ বাংলাদেশে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছি। পুঁজিবাদের শোষণের অবসানকল্পে দেশে দেশে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। আজকে লাতিন আমেরিকার ১৪টা দেশের মধ্যে ১২টা দেশে কোন না কোন রূপে সমাজতান্ত্রিক ধারার বিজয় সূচিত হচ্ছে। দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। আমরাও বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের লাল পতাকা উড্ডীন করার সংগ্রামে লিপ্ত আছি। আমরা রুশ বিপ্লব থেকে যেমন শিক্ষা নিব তেমনি তার বিপর্যয় থেকেও শিক্ষা নিব। সেই শিক্ষার আলোকে বাংলাদেশের অর্থনীতি-রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার দিকে অগ্রসর হব। আজকে দেশের বুর্জোয়া ব্যবস্থা ভিতর থেকে ক্ষয়ে গেছে, শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ ধাক্কায় তা উৎখাত হবে। আমরা যেমন বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন করবো, বকেয়া পাওনার দাবিতে, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আশু দাবিতে আন্দোলন-সংগ্রাম করব একইভাবে এই ব্যবস্থার অবসানের চূড়ান্ত লড়াইয়ে দিকে অগ্রসর হব। আমরা মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে, চলমান দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করব। আমাদের একক লড়াই যেমন চলবে আবার সকল বামপন্থি শক্তিকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হব। সমাজ বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী সমাজতন্ত্র আসবেই। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! মেহনতি মানুষের জয় অনিবার্য।